বিচার বিভাগীয় সন্ত্রাস



ভি.টি. রাজশেকর

বাকচর্চা । কলকাতা

বিচার বিভাগীয় সন্ত্রাস

ভি. টি. রাজশেকর
ও
ইকবাল আহমেদ শরিফ, আইনজীবী

অনুবাদ : এ. জাফর

বাকচর্চা
মোবাইল : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১

প্রথম প্রকাশ : ১৪ এপ্রিল, ২০১৬
আম্বেদকর-এর জন্মদিন
দ্বিতীয় প্রকাশ : আগস্ট, ২০১৯

৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট (কলেজ স্ট্রিট), কল-৯ থেকে প্রকাশিত এবং প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত। মূল্য : ১০ টাকা

মুখবন্ধ

ভারতীয় জনসমষ্টির অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ উচ্চবর্ণ হিন্দুরা এখন গভীর উদ্বিগ্ন। কারণ তারা বুঝতে পারছে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে তাদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে অহিন্দু শিবিরে, বিশেষ করে তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি, পিছড়ে বর্গ, মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের হাতে।

অসৎ উপায়ে হাসিল করা ক্ষমতা ও সম্পদ রক্ষা করতে ক্রমাগতই এদেশের উচ্চবর্ণগুলি শক্তিশালী বিচার ব্যবস্থার আশ্রয় নিচ্ছে। বিচার বিভাগের এই অংশে ভিড় করে রয়েছে উচ্চবর্ণের বিচারকরা। অন্যদিকে রয়েছে মনুবাদী প্রচার মাধ্যম। অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে প্রচার মাধ্যম পিছিয়ে পড়া সমাজের উপর সহিংস্র। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জাতি বিদ্বেষ তীব্র হচ্ছে এবং কোথাও তা সহিংস্র আকার ধারণ করছে। তবে শাসক শ্রেণী যদি তার প্রচার মাধ্যম, বিচার ব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র এমনকি পুলিশ নিয়েও ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর উদ্বেগের কারণ নেই কারণ, দাসত্বের শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছুই হারাবার নেই আমাদের। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের জাতি, শ্রেণী বিভেদ ও হিংসাকে আমরা স্বাগত জানাই কারণ আমরা মনে করি ভারতে সামাজিক ন্যায় মিলতে পারে একমাত্র জাতপাতের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। কারণ ভারতবর্ষে 'শ্রেণী' মানেই জাতি।

ভারতীয় সংবিধানে 'সামাজিক ন্যায়'-কে সর্বচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যার অর্থই হল প্রতিটি জাতি ও গোষ্ঠীর প্রতি সমান ন্যায়। সামাজিক ন্যায়ের একমাত্র অর্থ এটাই।

ভি. টি. রাজশেকর

ব্যাঙ্গালোর, দক্ষিণভারত

তারিখ : ১ জানুয়ারী ২০০৬

লোকতন্ত্র ও বিচার ব্যবস্থার সংঘাত

স্বাধীনতার পর এই প্রথম সংবিধানের দুটি শাখার মধ্যে 'সংঘাত' লক্ষ্য করার মতো। একটি হল উচ্চ বিচারব্যবস্থা যার প্রতিনিধিত্ব করে দেশের উচ্চবর্ণ এবং অন্যটি জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী লোকতন্ত্র।

লোকসভার স্পিকার সোমনাথ চ্যাটার্জী থেকে রাজ্যসরকারগুলো, সংসদরা, এমনকি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, জাস্টিস লাহোটি এই 'সংঘাত' এর বিষয়টি অস্বীকার করবেন। তবে এই সংঘাতটি হল আমাদের দেশে উচ্চ বিচারব্যবস্থার বিরুদ্ধে চাপা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। আমরা আনন্দিত যে বিচারপতি লাহোটি বোতলবন্দী এই ক্ষোভের মুখ আলগা করে দিয়েছেন। স্বাভাবিক এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ অনেক আগেই হওয়া প্রয়োজন ছিল। কারণ এতদিন ধরে দেশের নিপীড়িত মানুষ সামাজিক ন্যায় থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল।

সামাজিক ন্যায়ের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আদালত

উচ্চ বিচারব্যবস্থা যে সব জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করেছে তার বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে দলিত ভয়েস। দলিতদের দেশের সব থেকে পুরনো মুখপত্র হিসেবে যে কোনও মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদের প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি এবং আমরা তা করে চলেছি।

বিধানসভা ও লোকসভার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমরাও একমত যে সামাজিক ন্যায়ের ক্ষেত্রে ক্রমশই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে উচ্চ বিচারব্যবস্থা। মনে রাখা প্রয়োজন সংবিধানে সামাজিক ন্যায়কেই সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, উচ্চবিচার ব্যবস্থা এক মনোনীত প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত নয় মোটেই। লক্ষ্য করার বিষয় দেশের অতি নগণ্য সংখ্যক উচ্চবর্ণের মানুষ তাদের সম্পদ ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে উচ্চ বিচারব্যবস্থার আশ্রয় নিচ্ছে এবং বিচার ব্যবস্থাও অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে তাদের সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে।

সুপ্রিম কোর্টে মাত্র একজন দলিত প্রতিনিধি

সুপ্রীম কোর্টই শেষ কথা নয়। জনগণই সর্বচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন। সার্বভৌমত্ব থাকে জনগণের হাতে, আদালতের হাতে নয়। জনগণ তাদের ক্ষমতা হস্তান্তর করেন বিধায়ক বা সাংসদদের হাতে এবং পরোক্ষভাবে এইসব জনপ্রতিনিধিরা জনগণের হয়ে তাদের ক্ষমতা জাহির করে থাকেন।

অ-নির্বাচিত বিচারকদের আর পাঁচটা সরকারী কর্মচারীর মতই সরকার নিয়োগ করে। এরা বেতন তোলেন সরকারি তহবিল থেকে। জাত পাতের যাঁতাকলে পড়ে অত্যাচারিত মানুষের বঞ্চনা, যন্ত্রণা এদের বোঝার কথা নয়। এজন্যই বোধহয় বিচারকরা হন উঁচু জাতের। এ যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে উচ্চ বিচার ব্যবস্থায় সংরক্ষণের প্রয়োজন।

সুপ্রীম কোর্টে এখন একজন মাত্র বিচারক আছেন যিনি আদতে দলিত শ্রেণীভুক্ত। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. কে আর নারায়ণন যখন বিচারপতি বালাকৃষ্ণাণনের নাম প্রস্তাব করেন তখন তৎকালীন যুগ্ম বিচারপতি ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। শুধু তাই নয় দিল্লীতে ক্ষমতাসীন তদানিন্তন ব্রাহ্মণ্যবাদি সরকার প্রধান বিচারপতির যোগসাজসে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের হাতে তুলে দেন। এভাবেই বঞ্চিত শ্রেণীর একজনের বিচারপতি হওয়া সে সময় রোধ করা হয়েছিল।

সম্মান দেওয়ার বিষয় নয়, আদায় করে নিতে হয়

প্রধান বিচারপতি জাস্টিস লাহোটি ক্ষোভ প্রকাশ করে সে সময়ে বলেছিলেন 'আদালতের প্রাপ্য সম্মান তাকে দিতে হবে' (দ্য হিন্দু ২৮ আগস্ট ২০০৫)। সম্মান দাবি করা যায় না তা অর্জন করতে হয়। উচ্চ বিচারব্যবস্থা ক্রমশই মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছে। কিভাবে সে জনগণের সম্মান দাবি করতে পারে? বিচারপতি লাহোটির উষ্মা হিন্দু ন্যাৎসি পার্টির সাংসদেরও সেদিন চমকে দিয়েছিল। মুখপাত্র ভি কে মালহোত্র বলেছিলেন সামাজিক ঐক্য বজায় রাখার অধিকার সংসদের রয়েছে। সে সময় সি পি এম সাংসদ গুরুদাশ দাসগুপ্ত তার এক বিবৃতিতে বলেছিলেন সংবিধানকে খাটো করে সুপ্রীম কোর্ট এত বিদ্বেষ পূর্ণ, অসংযমী মন্তব্য আগে কখনও করেনি।

কার সঙ্গে কার লড়াই

প্রধান বিচারপতির ক্ষোভটি ছিল দেশের বঞ্চিত মানুষদের সংরক্ষণ ইস্যুকে কেন্দ্র করে। উঁচু জাতের মানুষরা মেরিটের ধুয়ো তুলে আমাদের সামাজিক ন্যায় থেকে বঞ্চিত করছিল। এতে যথার্থ সঙ্গত দিয়েছিল উচ্চ বিচার ব্যবস্থা। এরকম ভাবার কারণ নেই যে কোনও এক সকালে উঁচুজাতের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী হঠাৎই বদলেও যাবে। নেকড়ে কখনও মেষ শাবকের রক্ষাকর্তা হতে পারে না। তাই নেকড়ে আর মেষ শাবক পৃথক করা প্রয়োজন। দেশের পঁচাশি শতাংশ দলিত, উপজাতি, পিছড়েবর্গও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য ৮৫ শতাংশ সংরক্ষণের দাবি আমরা করেছিলাম। সংবিধানের ৯ তম অনুচ্ছেদের মধ্য থেকেই আমরা ওই দাবি করেছিলাম যাতে কোনও আদালত এতে বাধার সৃষ্টি করতে না পারে। আমরা মনে করি সংরক্ষণই আমাদের মানবাধিকার।

উচ্চবর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা হারাচ্ছে

আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হয়ে লাভা বেরিয়ে এসেছে বলে আমরা খুশি। জনপ্রতিনিধিত্বের লোকতন্ত্র ও উচ্চশ্রেণী নিয়ে গর্বিত উচ্চ বিচারব্যবস্থার বর্তমান এই সংঘাতকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। উচ্চ আদালত ক্রমাগত শুধু সামাজিক ন্যায়েই বাধার সৃষ্টি করছে না বরং সাংসদ ও বিধানসভার সার্বভৌমত্বকে খর্ব করছে। লোকসভার স্পিকার সোমনাথ চ্যাটার্জী স্বয়ং একথা বলেছেন।

বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষের যত বেশি চোখ খুলবে এবং যত বেশি করে তারা 'তাদের প্রতিনিধিদের' নির্বাচিত করবে তত বেশি করে উচ্চশ্রেণীর ক্ষমতা তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

সমস্যা নিরসনে সুপ্রীম কোর্টকে দেওয়া বিচারপতি নিয়োগের ক্ষমতা কেড়ে নিতে হবে সরকারকে। উচ্চ বিচারব্যবস্থায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। বিচারক নিয়োগ করতে হবে সমাজের বঞ্চিত মানুষের শ্রেণী থাকে।

প্রধান বিচারপতির ক্ষোভ দিল্লিকে খুব দ্রুত ব্যবস্থা নিতে নিশ্চয় সজাগ করেছে। যত শীঘ্র সম্ভব সংবিধান সংশোধন করে জনগন ও জনপ্রতিনিধিদের মর্যাদা দিতে হবে।

সম্পাদকীয় : দলিত ভয়েস ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৫।

'আধুনিক মনু'—তে পরিগণিত হচ্ছে সুপ্রীম কোর্ট

ইকবাল আহমেদ শরীফ, আইনজীবী

৯৪/১-১১ ট্যাঙ্ক ক্রশ ট্যাঙ্ক গার্ডেন

জয়ানগর, ফাস্ট ব্লক, ব্যাঙ্গালোর— ৫৬০০১১

ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই ছাত্র নির্বাচন ও ভর্তি করতে পারবে কিনা এ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের সাম্প্রতিক রায় 'শাহবানু' মামলার থেকেও বেশি বিতর্কের ঝড় তুলেছে। এর আগে দলিতরা মন্দিরে পুরোহিত হতে পারবে কিনা, পিছড়ে বর্গদের ও মুসলিমদের সংরক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ভয়ানক বিরোধিতা করা হয়েছে। সবকটি মামলাতে ক্ষতিগ্রস্থরা দেশের ৮৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী। এরা দলিত, পিছড়েবর্গ এবং সংখ্যালঘু। উপরের সবকটি বিতর্কতেই বিধানসভা ও লোকসভার জনপ্রতিনিধিরা বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণকেই সমর্থন করেছেন। সর্বশেষ বিতর্কিত বিষয়টির ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ শ্রেণী হল দেশের উচ্চবর্ণ, পুঁজিপতি ও শিক্ষা ব্যবসায়ীরা। এক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির পাল্টা প্রতিক্রিয়া হল —'আদালতগুলো বন্ধ করে দেওয়া হোক।'

বিচার বিভাগের বাড়াবাড়ি : জনগণের সঙ্গে বিচার বিভাগের তথাকথিত 'অতি উর্বর মস্তিষ্ক' সম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষের সংঘাত শুরু হয়ে গেছে। খুব ঠাণ্ডা মাথায় এ সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করে বিচার বিভাগের সীমানা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। জরুরী অবস্থার পর থেকেই বিচার বিভাগের মানসিকতা পরিবর্তিত হয়েছে। ওই সময়ের বহু মামলায় বিচার বিভাগের এই মানসিকতা লক্ষ্য করা গেছে। বিচার বিভাগ মনে করেছে তার সীমানার বাইরে রাজনৈতিক ও জনস্বার্থ বিষয়ে যথেচ্ছ হস্তক্ষেপ করা যেতে পারে। পরিবেশবাদি, পশুপ্রেমী, নারীবাদীদের মতো কিছু সমাজবিরোধী ধনী এন জি ও-র কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করেছে বিচার বিভাগ।

পি আই এল-এর বিপদ : জনস্বার্থের নামে বিচার বিভাগ সব থেকে বেশি জনস্বার্থ বিরোধী হস্তক্ষেপ করে থাকে বা রায় দিয়ে থাকে। জনপ্রতিনিধিরা পাঁচ বছর হলেও

অন্তত একবার জনগণের দরজায় গিয়ে সুনাম কিম্বা দুর্নাম কুড়িয়ে আসে। তা একবারও কেন ভাবে না বিচার বিভাগ? সাধারণ মানুষের জন্য জনপ্রতিনিধিদের দরজা দিনে অন্তত দু-ঘন্টা হলেও খোলা থাকে। মানুষের অভিযোগ এরা শোনে ও যথাসাধ্য সমাধান করার চেষ্টা করে। এরাই সব থেকে বড় বিচারকর্তা। জনস্বার্থ কি জিনিস এরাই সব থেকে ভালো বোঝে। আর যেহেতু জনগণের মধ্যে ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মুর্খ, উচ্চশ্রেণী-নীচুশ্রেণী, সংখ্যালঘু সবাই রয়েছে সেহেতু তারাই বিচার করতে পারে কোন বিষয়টির সঙ্গে জনস্বার্থের সম্পর্ক সবথেকে বেশি।

তাহলে সুপ্রীম কোর্টের মতো সর্বোচ্চ বিচার ব্যবস্থা কিভাবে জনস্বার্থের বিষয়টি সব থেকে ভাল জানতে পারে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারকদের যোগাযোগ নেই। এদের সবাই আসেন উচ্চন্যায়ালয় থেকে, আর উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারকরা নির্বাচিত হন কর্মরত আইনজীবীদের মধ্য থেকে। এদের অনেকেই মক্কেলদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কারণ উচ্চ ন্যায়ালয় হল রেকর্ড আদালত। শুনানির নয়। নিম্ন আদালতের শুনানির নথি উচ্চ আদালতের আইনজীবীদের দেওয়া হয়। খুব অল্প ক্ষেত্রে মক্কেলদের সঙ্গে আইনজীবীদের সাক্ষাত হয়। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ যারা জনগণকেই জানে না তারা কিভাবে জনস্বার্থ বুঝবে? তাই যেসব মামলায় বিবাদীর ব্যক্তি স্বার্থ জড়িত সেসব ক্ষেত্রে এই আইনজীবীদের মামলা লড়া অনুচিত। উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচার পদ্ধতির ধরণ হল ময়না তদন্তের মতো; সব নথিপত্র ঘেঁটে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।

বিচার বিভাগীয় স্বৈরাচার : জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলাগুলির ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতে বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে অবহিত করা যেত যাতে তারাও বিষয়টি নিয়ে তাদের মতামত দিতে পারে। দুনিয়া জুড়ে এটাই সর্বজনগ্রাহ্য আইনি পদ্ধতি—অন্যের কানে পৌঁছে দেওয়া (অড়ি পাট্রেন)। সামান্য এই টুকু বিচার ব্যবস্থা কেন করে না? মুষ্টিমেয় কয়েকজন সরকারি চাকুরে কি জনগন হতে পারে? এটাই সবথেকে বড় ধাঁধা। সংবিধান প্রণেতারা যা কখনও ভাবেন নি। গুটিকয় বিচারক ও আইনজীবী জনস্বার্থ মামলার ক্ষেত্রে দেশের সংবিধানের বাইরে নিজেদের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর বলে মনে করেন। এই মনভাব কাটাতেই বিচার ব্যবস্থার আমুল সংস্কার প্রয়োজন। কারণ এক ধরণের বিচার বিভাগীয় স্বৈরতন্ত্র এদেশে ক্রমশই

চেপে বসছে। এই অবস্থা যদি কাটিয়ে ওঠা না যায় তাহলে জনগনই একদিন হয়তো বলবে—'ঠিক আছে, বন্ধ করে দাও সুপ্রীম কোর্ট। একদল বড়লোক আপীলকারীদের জন্য ওটা খুলে রাখার কোন প্রয়োজন নেই।

সমস্যার কারণ : এত সবের পরেও দেশের সংখ্যাগুরু দলিত, সংখ্যালঘু ও পিছড়ে বর্গদের অন্য একটা সমস্যা রয়েছে। সমস্যাটা হল উচ্চন্যায়ালয়ের 'ন্যায় বিচার এবং শুভ বিবেক'-এর অধিকার প্রদর্শন। নিম্ন আদালত ও তার বিচারপতিরা যেখানে শুধুমাত্র আইন মাথায় রেখেই বিচার করে থাকেন, উচ্চন্যায়ালয়ে সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ন্যায় বিচারের জায়গা রয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারকরা নিজেদের 'শুভবিবেক' বলে মনে করেন অর্থাৎ আইন, ন্যায় বিচার ও শুভবিবেক একসঙ্গে কাজ করছে। ন্যায়বিচার আইনের উর্দ্ধে। অতীতেও এর সুন্দর নিদর্শন রয়েছে। রাজা সলোমানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান : সম্রাট জাহাঙ্গীর এক ধোপার পত্নির হাতে তীর-ধনুক তুলে দিয়ে সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়ে ছিলেন যাতে ওই মহিলা তাঁর বুকে তীর বিঁধিয়ে স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারে। উল্লেখ্য জাহাঙ্গীরের ভুলেই ওই ধোপার প্রাণ যায়। জাহাঙ্গীর খুব ভালো ভাবেই জানতেন ধোপার স্ত্রী তার বুকে তীর বিঁধতে পারবে না। ধোপা পত্নি যেহেতু সর্বোচ্চ বিচারকের কাছে ন্যায় বিচার চেয়েছিল সেহেতু ন্যায় বিচারের মানদণ্ডে তার বিচার করেছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। শুধু মাত্র আইন দিয়ে নয়। আইনের গণ্ডির মধ্যে আটকে না থেকে ন্যায় বিচার ও সমতার এই পরম্পরা এদেশে বহু পুরানো। কিন্তু জনস্বার্থ মামলার ক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থার 'শুভ বিবেকের' প্রয়োগ ক্ষেত্র অত্যন্ত বিশাল। ব্রিটেন, ফ্রান্স, পাকিস্তান, মিশরের মতো দেশে বিচার ব্যবস্থায় 'শুভ বিবেক'-এর একটি বড় ভূমিকা থাকলেও ভারতের মতো দেশে তা বিরল। কারণ ওই সব দেশে' বিচারক ও বিচার প্রার্থীরা সবাই কমবেশি একজাতি, ধর্ম ও মানসিকতার মানুষ। ওইসব দেশের বিবেক গঠনের মূল উৎস একই পবিত্র গ্রন্থ, দর্শন কিম্বা ইতিহাস।

কিন্তু ভারতের মতো দেশে পরিস্থিতিটা ভিন্ন। কারণ এখানকার মানুষের জাত, ধর্ম, দর্শন সবই ভিন্ন ধরণের। একজন মনুবাদীর বিবেক অন্যের থেকে আলাদা। ব্রাহ্মণের বিবেক দলিতদের থেকে— খ্রিস্টানের বিবেক মুসলিমের থেকে ভিন্ন।

এদেশে দলিত পিছড়ে বর্গ, সংখ্যালঘুর যন্ত্রণা বৈদিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা উচ্চবর্ণ বুঝতেই পারবে না। আর হাল আমলে রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ প্রতিদিনই উচ্চবর্ণের বিবেককে আরও বিষিয়ে দিচ্ছে।

শাহবানু মামলা, অসমের উদ্বাস্তু আইন, ব্যক্তি মালিকানাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত মামলার রায়ের ক্ষেত্রে এই বিবেক-ই সক্রিয় ছিল।

সুপ্রীম কোর্ট মুসলিম বিদ্বেষী : শাহবানু মামলা নিয়ে এক সময় দেশ জুড়ে মুসলিমদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সে সময় এমনও আওয়াজ উঠেছিল যে দেওয়ানি বিধি লাগু হবে মুসলিমদের লাশের উপর দিয়ে; একসময়ে এই মারাত্মক বিধিই দেশকে টুকরো করে ছাড়বে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বি জে পি—আর এস এস-এর মুসলিম বিদ্বেষী এজেণ্ডা জেনেও সুপ্রীমকোর্ট তার পরবর্তী রায়ে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে মত দান করে। অথচ বিজেপি যখন ক্ষমতায় এল তখন অভিন্ন দেওয়ানি ইস্যু চলে গেল ঠাণ্ডা ঘরে কারণ তারা জানে রাজনীতি মানেই ঘরে বাইরে বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে আপোষ ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রায় দু-দশক পর অসমীয়া মুসলিমদের নাগরিকত্বের অধিকার কেড়ে নিল সুপ্রীমকোর্ট। ১৯৮৯ সালের প্রথম ইললিগাল ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট বাতিল করা হল। এই রায়ের পিছন ছিল হিন্দু ন্যাৎসিদের কলকাঠি। মুসলিম স্বার্থ বিরোধী এক পিটিশনের ভিত্তিতে সুপ্রীমকোর্ট নিজে থেকে এক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল যার ফলশ্রুতিতে লাখ লাখ ভারতীয় মুসলিমের রক্তে গঙ্গা বয়ে গেল।

শরীয়ত আদালত : মুসলিমদের নিজস্ব শরীয়ত আদালতের ক্ষেত্রে সুপ্রীমকোর্ট বিরূপ মন্তব্য করেছে যা একেবারেই কাম্য নয়। সমান্তরাল কোনও বিচারব্যবস্থা একই দেশে চলতে পারে না বলে অভিমত প্রকাশ করেছে সুপ্রীম কোর্ট অথচ কোর্ট মার্সাল, ডিপারমেন্টাল এনকোয়ারি, ডোমেস্টিক এনকোয়ারি, মধ্যস্থতা, সমঝোতার মতো বিষয়গুলো দিব্যি চলছে। সুপ্রীমকোর্ট ভুলে গেছে যে মেডিক্যাল কাউন্সিল ও বার কাউন্সিলের মতো প্রতিষ্ঠান নিজেরা বিচার বসায়। প্রয়োজনে শাস্তিও দিয়ে থাকে। শুধু তাই-ই নয় উচ্চ বিচার ব্যবস্থায় নিজস্ব এক ডিসিপ্লিনারি কমিটি রয়েছে যা বিচারকদের ত্রুটি বিচ্যুতির বিরুদ্ধে রায় দিয়ে থাকে। কোর্ট ভুলে গেছে যে কাউকে আদালতে স্বতপ্রণোদিত হয়ে যেতে বাধ্য করা যায় না।

যে মুহূর্তে সুপ্রীম কোর্ট বুঝতে পারে যে কোনও মামলা ইসলাম বা মুসলিম স্বার্থ সম্পর্কিত সেই মুহূর্তেই কোর্ট ধৈর্য হারিয়ে অদ্ভুত সব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। এই ভাবনা থেকেই সুপ্রীম কোর্ট মন্তব্য করেছে যে সংখ্যালঘু কমিশনের উদ্দেশ্য হল ধীরে ধীরে সব ধরনের সংখ্যালঘুদের নিয়ে একটা দল পাকানো।

উচ্চ আদালত আর এস এস-এর ভাষায় কথা বলছে : প্রশ্ন ওঠে সুপ্রীমকোর্ট কার ভাষায় কথা বলছে? বিচারকরা, বিশেষ করে প্রধান বিচারপতি কোথা থেকে এত উৎসাহ পাচ্ছেন? সন্দেহ জাগে হয়তো হিন্দু ন্যাৎসিরা কয়েক দশক অপেক্ষার পর প্রধান বিচারপতির পদ পেয়ে দলিত, মুসলিম ও পিছড়ে বর্গদের বিরুদ্ধে আর এস এস-এর দর্শন ও বিষ উগরে দিচ্ছে না তো? ফলে মনুবাদ দর্শন ক্রমশই দেশের হাজার হাজার বিচারপতি ও আইনজীবীদের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। বেশ কয়েকজন প্রধান বিচারপতি খোলাখুলি ভাবে আর এস এস-এর মুখপাত্র হিসাবে কাজ করছেন। ফলে সুপ্রীমকোর্টের উপর মুসলিমদের আস্থা কমছে। হয়তো এমন একটা সময় আসবে যখন মুসলিমদের কোনও মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে হিন্দু বিচারকদের নিয়োগের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠবে। হাল আমলে সুপ্রীমকোর্ট তার রায়ে 'আধুনিক মনু'-র মতো আচরণ করছে। ফলে দেশের জন্যেও সুপ্রীমকোর্ট ভাবে নি কি ভাবে বিনা ব্যয়ে পড়াশোনা করে এদেশের মেধা বিদেশে চালান হয়ে যাচ্ছে। ব্রেন ড্রেনের বড় অংশই সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে থেকে হচ্ছে। এখন তাদের ছেলে মেয়েরাই বিদেশের থেকে অনেক সস্তায় এন আর আই কোটায় এদেশে পড়াশোনা করছে। সংখ্যালঘু, দলিত, পিঁছড়ে বর্গের ট্যাক্সের টাকায় এতো এক ধরণের হরির লুঠ।

চাই বিবেক বোধ সম্পন্ন বিচারক : বর্তমানে যা হচ্ছে তা হল দেশের উচ্চ বিচারব্যবস্থা দলিত, সংখ্যালঘু, পিছড়ে বর্গের স্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে আর আমরা আইনের ভয়ে কোনও প্রতিবাদই করছি না। বিদেশে এ পরিস্থিতি নেই। এদেশে উচ্চ বিচারব্যবস্থায় বিচারকদের 'শুভ বিবেক' সাধারণ মানুষের বিবেকের থেকে ক্রমশই তফাত হয়ে যাচ্ছে। এই পার্থক্য ঘোঁচানো প্রয়োজন। যার একমাত্র উপায় হল দেশের দলিত পিছড়ে বর্গ, সংখ্যালঘুদের ওই সব পদে বসানো। আর এটা করতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন বিচারপতি পদের সংরক্ষণ। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হলে তা প্রথমেই করতে হবে বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। এ ব্যাপারে আগেও আমরা বিভিন্ন মহলের সমর্থন পেয়েছি।

স্বাধীনতার সময়ে আমলাতন্ত্রের পুরোটাই ছিল উচ্চশ্রেণীর দখলে। সংরক্ষণ ব্যবস্থার পর দলিত ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর একাংশও ক্ষমতার অন্দরে প্রবেশ করল। তবুও এখনও তারা সংখ্যায় কম। লাভ এটাই হয়েছে যে অফিসে এদের সংসর্গে এসে উচ্চশ্রেণীর লোকজন সামাজিক ন্যায়ের বহু শিক্ষা পেয়েছে যা হাজার হাজার বই পড়েও হয় না।

সংরক্ষণের ফল : পিছিয়ে পড়া ও দলিত শ্রেণীর মানুষ বিচারকের আসনে বসলে শুধুমাত্র যে দলিত বিরোধী, সংখ্যালঘু বিরোধী কিম্বা পিছিয়ে পড়া শ্রেণী বিরোধী রায়দান কমবে তা নয় উচ্চবর্ণের বিচারকরা সামাজিক ন্যায়ও শিখতে পারবে। তাই সংরক্ষণ শুধুমাত্র জীবিকার প্রশ্ন নয় বরং তা জাতীয় সংহতির পক্ষেও অত্যন্ত শুভ। উচ্চ বিচার ব্যবস্থায় সংরক্ষণের অভাবেই ন্যায়নীতিহীন বিচার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভারতীয় সংবিধানে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলো অত্যন্ত জরুরী :

১) সব আদালতেই বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি।

২) উচ্চ বিচার ব্যবস্থায় দলিত, পিছিয়েপড়া, সংখ্যালঘু শ্রেণীর জন্য এমনভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যাতে উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি কখনই ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে না যায়।

৩) একটি কমিটি মারফত উচ্চবিচার ব্যবস্থায় বিচারক নিয়োগ করা উচিত। একই সঙ্গে প্রার্থীর সামাজিক ও আদর্শগত অতীত ও বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে।

৪) ৩২(২) ধারার অধীনে সুপ্রীমকোর্টের নির্দেশমূলক ক্ষমতার অবসান ঘটাতে হবে কারণ ২২৬ ধারাতেই উচ্চ ন্যায়ালয়কে সেই অধিকার দেওয়া আছে। শুধুমাত্র আবেদনের ভিত্তিতেই সুপ্রীমকোর্টের রায়দান করা উচিত।

৫) ১২৪ (৩) ও ২১৭ (২) ধারা এমনভাবে সংশোধন করা উচিত যাতে উচ্চবিচারালয়ের বিচারকদের কমপক্ষে ১০ বছর নিম্ন আদালতে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকে। যাতে করে বিচারপ্রার্থী, সাক্ষীর সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভিজ্ঞতা থাকে। এ ব্যাপারে সুপ্রীমকোর্টে নিজেরই এগিয়ে আসা উচিত নয়তো একদিন মানুষই পরিবর্তনের পক্ষে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।

দলিত ভয়েস ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৫ পৃষ্ঠা—৫

বিচার ব্যবস্থার ডানা ছাঁটার ক্ষমতা ধরে কে?

বিশেষ সংবাদদাতা : ২০০৫, ২৩ আগস্ট সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি আর সি লাহোটির 'ক্ষোভ' প্রকাশের পরও হিন্দু এই মাড়োয়ারী একইভাবে বিষেদগার করেছিলেন। ভোপালে এক সভায় তিনি বলেন লোকতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের ডানা ছাঁটার ক্ষমতা বিচার ব্যবস্থার আছে। (দলিত ভয়েস ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৫)।

তিনি বললেন। "আমলাতন্ত্র, লোকতন্ত্র ও বিচার ব্যবস্থা এই তিন প্রতিষ্ঠানের উচিত সংবিধানের গণ্ডির মধ্যে থেকে কাজ করা। এর বাইরে গেলেই বিচার ব্যবস্থা পারে তার ডানা ছেঁটে দিতে"। (পি টি আই ডেকান হেরাল্ড ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৫)।

আদালত অবমাননা : এক্ষেত্রে বিচারপতি কিন্তু বলেন নি যে বিচার ব্যবস্থার ডানা ছাঁটার ক্ষমতা কার রয়েছে। বিচার ব্যবস্থার উঁচু স্তরে যে দুর্নীতি রয়েছে তা স্বীকার করেছেন বিচারকরা নিজেরাই। হাজার হাজার মামলা ঝুলে রয়েছে। বিলম্বের অর্থ হল অভিযুক্তদের ন্যায় থেকে বঞ্চিত করা।

লোকসভার স্পিকার নীরব কেন?

লোকসভার স্টান্ডিং কমিটি বিচার ব্যবস্থার দিকে আঙ্গুল তুলেছে। কমিটি তার বক্তব্যে বলেছে যে আদালত অবমাননাকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যেন মনে হয় মিডিয়া যদি কোনও দুর্নীতির কথা ফাঁস করে দেয় তাহলে সেও আদালত অবমাননার ফাঁসে আটকে যাবে। উল্লেখ্য লেখিকা অরুন্ধতী রায়কে জেলেও যেতে হয়েছিল। আদালত কি জনগণ কিম্বা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের থেকে শক্তিধর? সার্বভৌমত্ব তাহলে রইল কোথায়? দুর্ভাগ্য এনিয়ে আমাদের দেশে কোনও বিতর্ক হয় না। এর একমাত্র কারণ উচ্চবর্ণের মানুষ এদেশে প্রভাবশালী। এরাই তৈরি করেছে বৌদ্ধিক দুর্নীতি পরায়ণ এক সমাজ।

লোকসভার মাননীয় স্পিকার সোমনাথ চ্যাটার্জি একসময় ঝাড়খণ্ড বিতর্কে বিচার ব্যবস্থার অবৈধ হস্তক্ষেপের কথা তুলে ঝড় তুলে দিয়েছিলেন। পরে বিভিন্ন জনস্বার্থ মামলায় বিচার ব্যবস্থার আমলাতান্ত্রিক আচরণের কথাও তুলেছিলেন। কিন্তু এখন তিনি নিশ্চুপ কেন?

দলিত ভয়েস ১ সেপ্টেম্বর ২০০৫ পৃষ্ঠা—৬

সুপ্রীম কোর্ট জনবিরোধী

ভি. টি. রাজশেকর

সংবিধান অনুযায়ী সংরক্ষণ আমাদের মানবাধিকার। দেশের বঞ্চিত জনসমষ্টির (তপসিলী জাতি/উপজাতি/পিছড়ে বর্গ/মুসলিম/খ্রিস্টান/শিখ) জনপ্রতিনিধি, নেতা ও সংগঠনগুলো সংরক্ষণের দাবি জানিয়ে আসছে এবং এর জন্য তারা লড়াইও করেছে। এক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থাও তাদের দাবিকে সমর্থন করেছে। কিন্তু পরে দেখা গেল আমাদের মানবাধিকারের শত্রুরা সংরক্ষণের দাবিকে বিপথ করে দেবার চেষ্টা করেছে। লোকতন্ত্র ও আমলাতন্ত্র সংরক্ষণের পক্ষে কিন্ত এতে বাধ সাধছে উচ্চবর্ণের মানুষ।

বিচারকরা সরকারি চাকুরের মতো

আমাদের মানবাধিকার ধ্বংস করার ক্ষেত্রে বিচারব্যবস্থার উঁচু স্তরের উচ্চবর্ণের প্রতিনিধিরা সব থেকে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করছে। আমরা সাবধান করে দিতে চাই যে এটা কখনই হবার নয়। আমাদের বাঁকানো যেতে পারে কিছু ভেঙে ফেলা একেবারে অসম্ভব। কারণ জনপ্রতিনিধিরা জনগণের দ্বারা মনোনীত হন কিন্তু বিচারকদের আর পাঁচটা সরকারী চাকুরেদের মতো নিয়োগ করা হয়। যদি তাই হয় তাহলে সেবক কখনই মনিবকে নির্দেশ দিতে পারে না। সার্বভৌমত্ব জনগনের। সেটাই গণতন্ত্রের মূল অর্থ। সামাজিক ন্যায়ের কথা মাথায় রেখে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড: কে আর নারায়ণন গুজরাট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বালাকৃষ্ণাণকে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। বিষয়টি আঁচ করতে পেরে উচ্চবর্গের বিচারকরা রাষ্ট্রপতির সেই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কটুকথা বলতেও ছাড়েন নি। প্রতিবাদে সুপ্রীমকোর্টের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন তপশিলী জাতি/উপজাতি কর্মচারীদের সংগঠনের প্রধান রাম রাজ। এই আন্দোলন আমাদের চালিয়ে যেতে হবে এবং প্রয়োজনে সুপ্রীমকোর্টও ঘেরাও করতে হবে।

সাম্প্রতিক রায় : বহু প্রতিবাদ সত্ত্বেও সুপ্রীমকোর্ট আমাদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক কিছু রায়ে বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার।

নতুন দিল্লি : সুপ্রীমকোর্টের এক সাংবিধানিক বেঞ্চ সম্প্রতি তার এক রায়ে বলেছেন যারা সংরক্ষণের আওতায় চাকুরি পেয়েছে তারা সাধারণ প্রার্থীদের উপরে সিনিয়রিটি পেতে পারে না। 'আমরা মনে করি ১৬(৪) ও ১৬(৪এ) ধারায় কোনও মৌলিক অধিকার দেওয়া নেই, সাংবিধানিক কর্তব্যের কথাও বলা নেই। তবে ধারা দুটিতে রাষ্ট্রকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখার রাস্তা খোলা রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সুপ্রীমকোর্টে ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য।

সংবিধানের ওই দুই ধারায় 'চাকরির ক্ষেত্রে দেশের জনগণের সমান সুযোগ ও নিয়োগের ক্ষেত্রে সমদৃষ্টির কথা বলা হয়েছে।' তবে রাষ্ট্রকে কখনই সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হয়নি'।...বেঞ্চের বক্তব্য।

শীর্ষ আদালতের সাম্প্রতিকতম রায়ে পরিষ্কার যে সংবিধানের অভিভাবক বা রক্ষক হওয়ার বদলে আদালত বিনষ্টকারী হিসাবে কাজ করছে।

গোটা উচ্চবর্ণ এই রায়ে স্বভাবতই উৎফুল্ল। গণতন্ত্রে শাসন করে সংখ্যাগরিষ্ঠরা। ভারতে তপশিলী জাতি/উপজাতি/পিছড়ে বর্গ/মুসলিম/খ্রিস্টান/ শিখরাই সংখ্যাগুরু। অর্থাৎ সুপ্রীমকোর্টের এই রুলিং জনগণের ইচ্ছার বিরোধী। অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্ট জনবিরোধী।

বিতর্ককে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি

ভারতবর্ষের আদি বাসিন্দাদের সঙ্গে বিদেশী আর্যদের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী এবং এ জিনিস এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। বিচারব্যবস্থা এই সংঘাতকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। আমরা একে স্বাগত জানাই। সমাজের উচ্চবর্ণের স্বার্থ রক্ষা করতে হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষমতা হাতিয়ে নিয়েছে সুপ্রীমকোর্ট। আইন মন্ত্রী রাম জাঠমালানি সহ অন্যান্যরা সুপ্রীমকোর্টের এহেন কর্মকাণ্ডের তীব্র বিরোধীতা করেছেন। সুপ্রীমকোর্ট চায় বিচারপতি হিসেবে উচ্চবর্ণের লোকজন বা তাদের তাঁবেদাররা আসুক যাতে করে তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। সংসদে এখন একাধিক দলিত পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর প্রতিনিধি রয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে তাদেরই আওয়াজ তুলতে হবে।

—সম্পাদকীয় দলিত ভয়েস ১. ৬. ১৯৯৯।

সামাজিক ন্যায়কে ঠেকাচ্ছে বিচারব্যবস্থা

বিশেষ সংবাদদাতা : ভারতবর্ষে সামাজিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বহু ধরণের বাধার মধ্যে বিচার ব্যবস্থার বাধা সব থেকে বেশি। উল্লেখ্য এই বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ আসন দখল করে রয়েছে উচ্চবর্ণের মানুষ। দলিত ভয়েসে এনিয়ে বহুবার লেখা হয়েছে।

ভারতের প্রথম দলিত রাষ্ট্রপতি ড. কে আর নারায়নানের করা উচ্চ বিচার ব্যবস্থায় সংরক্ষণের সুপারিশের সমালোচনা করেছিলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ এস আনন্দ। এক্ষেত্রে আমাদের ভাবতে হবে কি ভাবে এই জন বিরোধী বিচার ব্যবস্থাকে বাগে আনা যায়।

সংবিধানের সুপারিশ মেনে আমাদের দেশের সংসদ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উচিত সর্বভারতীয়ভাবে বিচারপতি নিয়োগের পরীক্ষা নেওয়া।

ভারতবর্ষই বোধহয় একমাত্র দেশ যেখানে হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের একমাত্র ক্ষমতা ধরে সুপ্রীম কোর্ট। লক্ষণীয় সুপ্রীম কোর্টে একজনও দলিত বিচারপতি নেই। দেশের তপশিলী জাতি, উপজাতিদের উচিত বিচার ব্যবস্থার দ্বিচারিতার মুখোশ খুলে দেওয়া। রাষ্ট্রপতি নারায়ানানকে ধন্যবাদ যে ঠিক সময়ে তিনি ভারতের এক মহা বিপদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

—দলিত ভয়েস ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ পৃষ্ঠা-৪।